জলসংসার

জলসংসার

তাহসিনুল ইসলাম

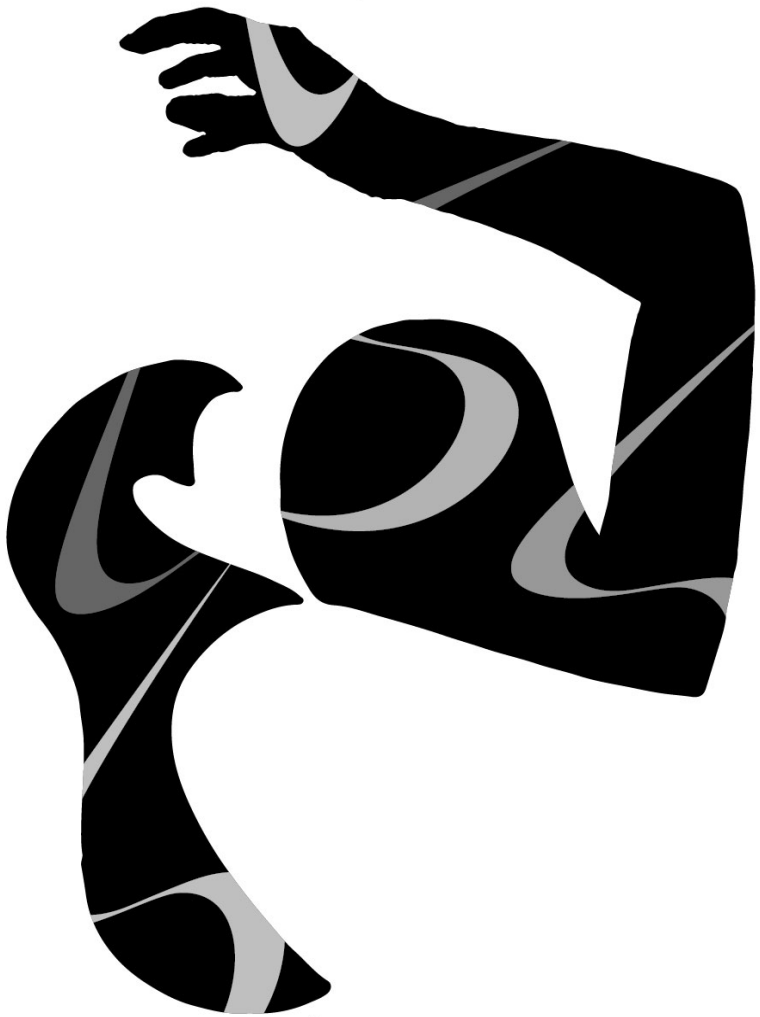

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Jalsongsar by **Tahsinul Islam**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021

Price : 500.00
US $ 25

ISBN 978 984 95365 4 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

শামস সাইদ

আমি আজ পর্যন্ড় যে কয়েকজন বরিশালের মানুষের সঙ্গে মিশেছি তারা কমবেশি সবাই ভালো। তবে এই মানুষটি একটু বেশি ভালো।

'আত্মহত্যা' শব্দটার শরীর ও আত্মায় যে বিষণ্নতার ভার, চূড়ান্ড় বিচ্ছেদের যে ব্যথাতুর শোক— সেই শোক ও বিষণ্নতার ব্যবচ্ছেদ শেষে ইরা সিদ্ধান্ড় নিয়েছে সে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু কীভাবে আত্মহত্যা করবে এই সিদ্ধান্ড়টা সে এখনো নিতে পারছে না। আত্মহত্যার কারণের চেয়ে আত্মহত্যায় কী করণীয় এটাই এখন তার কাছে বড়ো পীড়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওড়না গলায় পেঁচিয়ে ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যার কথা সে ভাবতে পারছে না। ওতে তার মন বলছে ছটফটানি বাড়বে আত্মার। ঘুমের বড়ি এনে রেখেছে। ইঁদুর মারার বিষ আছে, দোকানি বলেছে এ বিষ অব্যর্থ, কিন্তু তারপরও সে সাহস পাচ্ছে না। ঘুম ইতোমধ্যে তার চোখের কাছে এক দুষ্প্রাপ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই ওই ঘুমের ওষুধে মরার বিশ্বাস তার নেই। ইঁদুর মারার অব্যর্থ বিষের কার্যকারিতা নিয়েও তার মন যথেষ্ট সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওগুলো পেটে পুরে যদি ভেরোনিকার মতো অবস্থা হয়— আত্মা শরীর-খাঁচা থেকে বের হতে-না-হতেই নিজেকে যদি সে আবিষ্কার করে হাসপাতালের বিছানায়। কী ভয়ানক ব্যাপারই না হবে তা! একটা মোটা নল পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দে নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেই কর্কশ দানবনল। মৃত্যুর যন্ত্রণার থেকেও সেই যন্ত্রণা হবে অধিকতর অসহনীয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই, ইরা যেমনটা ভেবেছিল, তার চেয়েও দ্র"তগতিতে শোলের ঝাঁকের মতো ঘন অবসর ধেয়ে এলো। পরীক্ষা যখন চলছিল, প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন থেকেই তার শিরা-উপশিরায় অবকাশ উদ্‌যাপনের তীব্র আনন্দস্রোত বইতে শুর" করে। শেষ পরীক্ষাটা সে দিলো অনেকটা ঘোরের মধ্যে। পরীক্ষানামক অমানবিক দৈত্যের রূঢ়তা ও আসন্ন ছুটিতে নিসর্গের মাঝে হারিয়ে

যাওয়ার ভাবনায় দোল খেতে খেতে। শেষ পরীক্ষার দিন র"মে পরীক্ষকের দায়িত্বপালন করা গণিতের পেটমোটা রাশভারী শিক্ষক মহোদয়ের নাকের পাদদেশে বসে থাকা চার্লি চ্যাপলিনের মতো অসম্পূর্ণ খাটো গোঁফটাকেও তার কাছে মনে হচ্ছিল যে, ওটা যেন তার ছোটো খালার বাড়ির ছোটো নদীতে স্থির বসে থাকা ছোটো কোনো ডিঙিনৌকা।

চোখ বন্ধ করে ফুসফুসে মুক্তির দীর্ঘ বাতাস টেনে যখন সে শেষ পরীক্ষাশেষে রাস্ড়ায় বেরিয়ে এলো, বুনো খ্যাঁকশিয়ালের মতো দ্র"তগতিতে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা তাকে পালানোর সুযোগ না দিয়েই ধেয়ে এলো আকাশ থেকে। ইরা অবশ্য সুযোগ পেলেও বৃষ্টির সুশীতল পরশ এড়িয়ে পালাত না। কেননা, বৃষ্টিটাকে তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছিল না— মনে হচ্ছিল ওটা যেন তার মনে ক্লান্ড়ির ভার হয়ে জমে থাকা মেঘের জল হয়ে গলে পড়া।

বৃষ্টিস্নাত কদমফুলের মতো চুপসে যাওয়া চেহারা নিয়ে বাড়িতে এসে, মায়ের বিস্ময় চাহনি ও ভর্ৎসনার শব্দমালা উপেক্ষা করে ইরা গোসল ঘরে ঢুকল আগে। হঠাৎ নেমে আসা বৃষ্টি প্রবল কোনো চিহ্ন না রেখে, যেমনটা হয়, হঠাৎই উধাও হয়ে গেছে। আকাশে জেগে উঠেছে প্রদীপ্ত সূর্য। আর্দ্র বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার উজ্জ্বল সোনালি রেণু। ইরা দুপুরের খাওয়াশেষে, ঠিক জানে না কতদিন পর, বেশ কিছু সময় ঘুমাল। তার মা প্রায় বলতেন যে দুপুরের ঘুম মানুষকে মোটা বানিয়ে দেয়, ব্যাপারটা সম্পর্কে যদিও তার নিশ্চিত কোনো জ্ঞান ছিল না কখনোই। ইরা এই মুটিয়ে যাওয়ার ভয়েই দুপুরের খাওয়ার পর চোখে অলস আদুরে ঘুম জড়িয়ে এলেও শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিত না এবং এই কাজটা যে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করার চেয়েও কঠিন, মাঝে মাঝে নিজের মনোবলের দৃঢ়তার উদাহরণস্বরূপ ব্যাপারটা সে তার মায়ের কাছে উপস্থাপন করত।

একশো এগারো মিনিট পর দিনের নিদার"ণ ঘুমটা যখন ভাঙল, যেমনটা অনেকের কাছেই মনে হয়, ইরার কাছেও পৃথিবীটাকে তখন অর্থহীন মনে হতে লাগল। শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দুহাত দিয়ে দুই হাঁটুকে ধনুকের মতো জড়িয়ে ধরে বসতেই তার মনে হলো সে যেন

সীমাহীন এক শূন্যতার মাঝখানে তলিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা, জলের স্রোত যেমন শামুকের মতো পাক খায়, ঠিক তেমন পাক খেয়ে ঘুরছে। গালের মাংসগুলো ভারী ভারী লাগছে। সময়টাকে তার কাছে মনে হচ্ছে যেন থমকে গেছে কোনো এক বিভীষিকাময় গোলকধাঁধায়। ইরা এই ব্যাখ্যাতীত মুহূর্তে, কোনোকিছুই না, শুধু এক কাপ চায়ের প্রয়োজন অনুভব করতে লাগল প্রবলভাবে।

ঝকঝকে বিকেল। ইরা উষ্ণ গোলাপি চা হাতে ঝুলবারান্দায় এসে বসল বেতের দোলচেয়ারে। এই গোলাপি চা, যা কাশ্মীরি চা নামে প্রসিদ্ধ, ইরা এটা তৈরি করতে শিখেছে ইউটিউব-ভিডিয়ো দেখে। ভিডিয়োতে গোলাপি চা তৈরির প্রণালি যেদিন সে দেখে, সেদিনই স্টার মসলা ও বেকিং সোডা কিনে আনে, যা গোলাপি চায়ের বিশেষ উপাদান। এছাড়া আর টুকটাক যা দরকার, যেমন— এলাচ দানা, দুধ, গ্রিন টি— ওগুলো বাসাতেই ছিল। কিন্তু আবেগের আতিশয্যে উপাদান তড়িঘড়ি কিনে নিয়ে এলেও গোলাপি চা এতদিন তার তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। পরীক্ষাশেষের এই প্রফুল্ল বিকেলে গোলাপি চা প্রথম তার হাতে তৈরি হলো মাত্র বিশ মিনিটেই এবং তা বেশ প্রশংসা কুড়াল। প্রশংসাটা এলো তার মায়ের কাছ থেকে। তার মা ফারহানা রহমান এক সময় একটি বেসরকারি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, যার চেহারায় একটা মার্জিত রুচিশীলতার ছাপ ছিল স্পষ্ট, একদিন নির্জনে ফারহানা রহমানের বুকে হাত দেন। ফারহানা রহমান ঘটনার আকস্মিকতায় ওইদিন এতটাই স্তম্ভিত ও বিবমিষাক্রান্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি তার চোখ থেকে চার আঙুল দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা জলজ্যান্ত প্রধান শিক্ষককে দেখতে পান, মানুষ না, নোংরা একটা পশু এবং পশুটার শরীর ও আত্মা থেকে নির্গত দুর্গন্ধের কারণে বিবমিষা ও ঘৃণায় অসাড় হয়ে আসা শরীরটা নিয়ে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে পালিয়ে আসেন শিক্ষক সাধারণ রুমে। পরে অর্ধশত ছাত্র ও ডজনখানেক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের গালে এক মাস আগে কেনা তার সাটিনের স্যান্ডেল দিয়ে পরপর দুটো বাড়ি দেওয়ার সময় প্রচণ্ড ক্ষোভে চিৎকার করে বলেন, 'এই লোকটা মানুষ নয়, কুৎসিত একটা জানোয়ার,' এবং তখনই

কাউকে কোনোকিছু বলার ও শোনার সুযোগ না দিয়ে এক স্যান্ডেল বাম পায়ে ও এক স্যান্ডেল ডান হাতে নিয়ে টলতে টলতে স্কুলকে চিরবিদায় জানিয়ে চলে আসেন।

চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, মাঝারি গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, কোঁকড়ানো চুল ও চা-চামচের মতো মুখে চকলেট ফ্রেমের চশমা এবং অল্প-কথা-বলা ঠোঁট ও তাতে সহসা ধেয়ে আসা হাসিতে ফারহানা রহমানের ব্যক্তিত্ব যেন যুগপৎ কোমলতা ও কাঠিন্যের এক সমসত্ত্ব মিশ্রণ। রান্নাবান্নার কাজ ব্যতীত বাকি সময়টা তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন। তার ঘরটা একটা লাইব্রেরি। সেখানে ঢুকলেই দুই ভিন্ন প্রকৃতির গন্ধ নাকে ধেয়ে আসে— কর্পূরের গন্ধ ও বইয়ের গন্ধ এবং স্বভাবতই কর্পূরের গন্ধটা বইয়ের গন্ধকে ছাপিয়ে নাক দখল করে আগে। এরপর একটু স্থির হলেই বইয়ের স্যাঁতসেঁতে প্রাচীন গন্ধটা অনুভূত হয়। বইয়ের গন্ধ ও কর্পূরের গন্ধ— দুই ধরনের গন্ধই ফারহানা রহমানের মন ভালো করে দেয়। কর্পূরের শরীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে বাতাসে মিশে যাওয়া গন্ধে, শিউলিফুলের যেমন মনকে বিভোর করে দেওয়ার মতো গন্ধ আছে প্রবল, ঠিক এমনই এক ধরনের বিভোরতা আছে। ছোটোবেলায় ফারহানা রহমান খুব সকালে চুপিচুপি শিউলিফুল কুড়িয়ে এনে বিছানায় ছড়িয়ে রাখতেন, আর এখন বিছানায়, বইয়ে, টেবিলে, শাড়িতে, ড্রয়ারে, সবখানে ছড়িয়ে রাখেন কর্পূর। কর্পূরের গন্ধ ও চেহারার সাথে শিউলিফুলের চেহারা ও গন্ধের যদিও কোনো সাদৃশ্য নেই, কিন্তু তারপরও ঘরে এলোমেলোভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা কর্পূরের দানাগুলোকে তার কাছে মাটির বুক ছুঁয়ে থাকা শৈশবের শিশিরসিক্ত সফেদ শিউলিফুলের মতোই মনে হয়। কর্পূরের প্রতি ফারহানা রহমানের এই তুমুল দুর্বলতা বা ভালোলাগাটা অবিমিশ্রভাবে শুধু ওটির সুগন্ধ গুণের জন্য সৃষ্টি হয়নি, এতে ওটির তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টির কারিশমা ও ছারপোকা তাড়ানোর আশ্চর্য ক্ষমতাও সংযুক্ত। ফারহানা রহমানের ঘরে কর্পূরের কঠিন দানাই শুধু নয়, ওটির তরল তেলের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে তিনি তার বালিশে অল্প পরিমাণ কর্পূরের তেল ঢেলে দেন। অভাবনীয়ভাবেই এই তেলের গন্ধে তার চোখে ঘুম নেমে আসে দ্রুত

এবং তা আসে গভীর ও গাঢ় ভাব নিয়ে।

সাংসারিক জীবনের কথা যদি বলা যায়, আপেক্ষিক কিংবা সমাজের প্রচলিত মানদণ্ডের বিচারে, নিঃসন্দেহে ফারহানা রহমান একজন সুখী মানুষ। তাদের বাড়ি বিক্রমপুর। তার বাবা, যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েন এবং পরবর্তীতে মৃত্যুর অতল অন্ধকারে ডুবে যাওয়া অবধি নিরাময়-অযোগ্য পেটের পীড়ায় ভুগতে থাকেন, তাকে লালন করেন রাজকন্যার মতো, যদিও তিনি রাজা ছিলেন না, ছিলেন মাঝারি মাপের একজন ভূস্বামী। ফারহানা রহমানের শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের একাংশ যেখানে গ্রথিত হয়ে আছে হাজারো রঙিন স্মৃতির সুতোয়, সেই বিক্রমপুরে তাদের বিশাল সীমানাঘেরা দালানবাড়ি আছে এখনো। তিনি ছিলেন তার বাবার চোখের শীতলতা। তাকে দূরে বিয়ে দিয়ে প্রগাঢ় আড়াল হতে দিতে চাননি বলেই তার বাবা বিক্রমপুরেই তার বন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সহযোদ্ধার স্নাতকধারী কৃষক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন, যাদের ভূসম্পত্তি ছিল তাদের চেয়েও বেশি। ফারহানা রহমানের বাবা ভেতরে ভেতরে এক প্রচ্ছন্ন শঙ্কায় তাড়িত হতেন এই ভেবে যে, প্রেমনামক বিধ্বংসী ও সুশোভিত একটা অনুভব, যা মানুষকে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবশ করে দেয়, না জানি তার প্রজাপতিসম মেয়েও সেই অনতিক্রম্য অনুভবের ফাঁদে আটকা পড়ে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। হৃদয়ে সঞ্চিত খাদহীন ভালোবাসার প্রাবল্যের কারণে বাবার মনের গহিনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা শঙ্কা, যা তার সাবলীল চেহারায় ছেদচিহ্নের মতো ফুটে উঠত নিজস্ব ঢঙে, আর কেউ না বুঝলেও ফারহানা রহমান ঠিকই তা বুঝতে পারতেন। এজন্য তিনি মনের দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলেন শক্তভাবে, যদিও সেই বদ্ধ দরজা অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে খুলে যেতে ধরেছিল বহুবার। কিন্তু ওই উদ্দাম হাওয়া থেমে যাওয়ার পর ব্যাপারটাকে ফারহানা রহমানের কাছে নিরর্থক ও স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার একপ্রকার দম্ভ মনে হতো। তবে প্রেম তাকে খাদে ফেলতে না পারলেও, তার স্মৃতির খেরো খাতা সমৃদ্ধ করেছে মনোহারী কিছু গল্পে, যা তিনি অসংখ্য থোকা থোকা গল্প থেকে তুলে

নিয়েছেন, গ্রীষ্মের ঝড় থেমে যাওয়ার পর এলোমেলো পাতা আর শুষ্ক ডালপালা ভরা উঠোন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া আমের মতো। তিনি স্মৃতিতে শুধু গল্পই জমিয়েছেন, গল্পকারকে নয় এবং এজন্যই তা কখনো তিক্ত অনুতাপের বাষ্প হয়ে নির্গত হয় না বরং হঠাৎ আনন্দের ফোয়ারা হয়ে মনের ভেতর উত্থিত হয়। তার সঞ্চিত গল্পগুলো বড়ো নয়, কেননা তিনি গল্পকারকে শুরুতেই নির্দয়ভাবে থামিয়ে দিতেন। ওগুলো অণুগল্পের থেকেও ছোটো, কখনো-বা একবাক্যেই তা সীমাবদ্ধ। আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে, তার মনকে যে গল্পটি বিমুগ্ধ করেছিল, যার আলোকিত রেশ দীর্ঘদিন তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল এবং এখনো যে আবেশ ম্লান হয়নি, তা ছিল হেমন্তের একদিনে বইয়ের ভাঁজে পাওয়া একবাক্যের একটি চিরকুট। চিরকুটটা পাওয়ার পর ফারহানা রহমানের মনে চিরকুটদাতাকে দেখার একটা প্রবল বাসনা জেগেছিল। কিন্তু চিরকুটদাতা তার সামনে কখনোই প্রকট হয়নি এবং তিনি সেই গোপন চিরকুটদাতার কাছ থেকে আর কখনো কোনো চিরকুটও পাননি। এই প্রগাঢ় গোপনীয়তাই হয়তো তার কাছে ওই একমাত্র পাওয়া চিরকুটটার মাধুর্য বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রেমের হাতে সহজে ধরা দেননি বলেই প্রেম পরবর্তীতে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে তার ওপর আছড়ে পড়েছে, কিংবা তিনিই তাকে নিবিড় নিষ্ঠার সাথে মনের অন্তিম তল অবধি নিংড়ে নিয়েছেন, যেভাবে খনিশ্রমিক খনির অতল খুঁড়ে বের করে আনে প্রোথিত রত্নরাজি। ফারহানা রহমান বিয়ের আগে তার বাবার বন্ধুর ছেলে আব্দুর রহমানকে দেখেছেন। আব্দুর রহমানকে প্রথম দেখে তার মনে হয় ডিম ফুটে সদ্য বের হওয়া মুরগির বাচ্চার মতো লাজুক, যদিও তার শারীরিক গঠনে কোমলতা ছিল না। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, মেদহীন শক্ত শরীর, স্থূল শিরাবহুল হাত, নাকের মধ্যখানে মাঝারি আকৃতির একটা তিল ও ডান ভুরু ছুঁয়ে কপালের ওপর ছিল আরবি দাল বর্ণের মতো একটা কাটা দাগ, যা তার আয়ু অবধি টিকে থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে ছিল— সবকিছু মিলিয়ে, গোচরীভূত ও অগোচরীভূত, ফারহানা রহমানের মনে তাকে প্রথম দেখার পর আরও যে ছবিটা উঁকি দেয়, যেটি সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, হতে

পারে তা কোনো গেরিলাযোদ্ধার ছবি কিংবা কোনো সেনাসদস্যের ছবি। তবে মনে ভেসে ওঠা ছবির সাথে রক্তমাংসের ছবিটির নিটোল সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও ধূসর গোঁফের অপূর্ণতা অনুভূত হচ্ছিল স্পষ্ট, যা তিনি তার চেহারায় বসিয়ে দিয়েছিলেন কল্পনায়। তখন তিনি জানতেন না, যেমনটা জানতেন না আব্দুর রহমানও যে, তারা বাকি জীবনটা, গার্হস্থ্য প্রেমের টুকিটাকি ঝামেলা বাদে, একসাথে কাটিয়ে দেবেন নিভাঁজ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধুর্যে ডুব দিয়ে।

আব্দুর রহমানের সাথে প্রথম দেখা হওয়ার পর ফারহানা রহমান তাকে আরও অনেকবার দেখেছেন : রাস্ড়ায়, মাঠে, ঘাটে, বনে আর কখনো কখনো মনে। সেই অপরিবর্তনীয় শান্ড় ও অচঞ্চল মূর্তি। মুখোমুখি পড়ে গেলে স্মিত হেসে বলতেন, 'চাচা কেমন আছেন,' এবং ওই একটাই নাতিদীর্ঘ বাক্য তার ঠোঁটে রেকর্ডের মতো বাজত সব সময়, যদিও তা ছিল কৃত্রিমতাবর্জিত। ফারহানা রহমান নিজের ব্যাপারে যদিও তার মুখ থেকে কিছু শুনতেন না, কিন্তু তার বাবাকে ঘিরে ওই একটিমাত্র বাক্য যে গভীরতা, আন্ড়রিকতা, উষ্ণতা ধারণ করত তা তাকে মুগ্ধ না করে পারত না। আরও যে বিষয়টি চুম্বকের মতো আকর্ষিক শক্তি নিয়ে মনকে মুগ্ধতার কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে নিয়ে যেত তা হলো মেয়েদের সাথে তার আচরণের ধীরগতিসম্পন্নতা। বিয়ের পর তাকে তিনি এমনটাই পেলেন যেমনটা তাকে দেখেছিলেন। তার চরিত্রে কোনো ভণিতা ছিল না, বরং তার ভেতর আবিষ্কার করলেন আরও অনেক বাস্তব ও পরাবাস্ড়ব সৌন্দর্য। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে রান্নাবান্নার প্রাকমুহূর্তে আব্দুর রহমান যখন অকস্মাৎ ঝড়ের মতো এসে, তার পাশে বসে, পিঁয়াজ কাটতে শুর" করেন গুনগুনিয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার গাল বেয়ে জল নামতে শুর" করে গলগলিয়ে, ফারহানা রহমান তার স্বামীর বাস্ড়ব ও পরাবাস্তবের মাঝামাঝির এই নির্মল রোমান্টিকতায় মুগ্ধ হন সবচেয়ে বেশি। তিনি সেই মুগ্ধতা প্রকাশ না করে যখন হাসতে থাকেন উচ্চশব্দে, তখন আব্দুর রহমান তাকে রোমান্টিকতার শিখরে নিয়ে যান তার জাদুকরী বাক্যের ঐন্দ্রজালিকতায় : তোমার প্রেমে পড়ার পর তো কাঁদার

সুযোগ পেলাম না, তাই সে দায়িত্ব পিঁয়াজের হাতে তুলে দিয়েছি।

তাদের বিয়ের এক বছর তিন মাস সাতাশ দিনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে ফারহানা রহমানের বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবা, তার মনে কষ্টের দুর্বহ ভার চাপিয়ে মারা যান, দীর্ঘদিন থেকে টেনে আনা পেটের পীড়ায় নয়, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ড় হয়ে। ইরা ইহজগতে এলো তার নানার মৃত্যুর দুবছর পর এবং তারও দেড় বছর পর সে মোহন কণ্ঠে বাতাসে ছুড়ে দেওয়া শব্দগুলো উচ্চারণ করত, বিকৃত কিংবা অবিকৃতভাবে, কখনো-বা অতিপ্রাকৃতিকভাবে। ওই সময় 'দাদা' শব্দটা উচ্চারণ করত সবচেয়ে নির্ভুল ও তিন আলিফ পরিমাণ মাদ সহকারে। তার দাদা নাতনির সুরেলা কণ্ঠে মধুর দাদা ডাক শোনার আনন্দ ও মায়া নিয়ে যখন সংসারজগতের সৌন্দর্যকে আরও নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন, তখন তিনিও না-ফেরার দেশে চলে গেলেন, যদিও সে দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা তার মাথায় ছিল না।

ইরার বয়স যখন দশ বছর, তার বাবা-মা তখন বিক্রমপুর ছেড়ে ঢাকায় চলে এলেন। ইরা ততদিনে বিড়ালছানার মতো তুলতুলে একটা ভাই পেয়েছে এবং সেও কথা বলতে শুর" করেছে মধুর ভাঙা-ভাঙা শব্দে। তার বাবা আব্দুর রহমান ঢাকার মোহাম্মদপুরে মাঝারি আকৃতির একটা কাপড়ের দোকান দিলেন। বিক্রমপুরে তিনি ব্যাবসাটা সম্পর্কে একটু একটু করে জ্ঞান অর্জন করে আসছিলেন দীর্ঘ প্রায় দুবছর থেকে। তিনি তার নিষ্ঠা, সততা, সদ্ব্যবহার ও পরিশ্রমের দ্বারা ব্যবসায় দ্র"তই উন্নতি লাভ করলেন। মাঝারি দোকান বড়ো হলো। হৃষ্টপুষ্ট হলো। ব্যাবসার পাশাপাশি তিনি বিক্রমপুরে, বাবার মৃত্যুর পর বণ্টনে পাওয়া জমিতে ফসল চাষের কাজটাও সুনিপুণ দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেতে লাগলেন মৌসুমে মৌসুমে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় বাসাভাড়া নিয়ে থাকার পর অবশেষে গত দেড় বছর আগে মূল ঢাকার অদূরে কিনে রাখা জমিতে তিন তলাবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ করেছেন এবং পরিবারকে নিয়ে সেখানে উঠেছেন স্থায়ীভাবে। এই বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে তাকে সঞ্চিত টাকার সাথে গ্রামের দুই বিঘা জমি বিক্রির টাকাও যোগ করতে হয়েছে। তার বাড়িতে এখন দুটো পরিবার ভাড়া থাকে। একজন

ভাড়াটিয়া হিসেবে তিনি ঢাকা শহরে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার নিজের বাড়িতে ভাড়া থাকা পরিবারগুলোকে তিনি কখনোই সেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে দেন না।

নিউমার্কেট-সিটি কলেজ-ঝিগাতলা-মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড হয়ে যে রাস্তাটি তিনমাথা অতিক্রম করে চলে গেছে সোজা, সেই রাস্ড়া ধরে আরও কিছুদূর এগোলেই চোখে পড়বে ঐতিহাসিক চৌদ্দই ডিসেম্বরে শহিদ হওয়া পুণ্যাত্মাদের দুর্বহ ভারবহনকারী ব্যথাতুর রায়েরবাজার বধ্যভূমি। এই জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় বুক নৃশংস গুলির আওয়াজে কেঁপে ওঠে, চোখে ভেসে ওঠে তাজা তাজা প্রাণহীন দেহ, আর মনটা সমাধিগুলোর চারপাশের বিষাদগ্রস্ড় বাতাসের করুণ শীতল স্পর্শে আর্দ্র হয়ে ওঠে। এই বিষাদপুর পার হলেই মেট্রোহাউজিং এলাকা। তিনমাথা অতিক্রম করার পর মার্কেট-বিল্ডিঙের যে অপর্যাপ্ততা চোখে পড়তে শুরু করে, মেট্রোহাউজিং এলাকা অতিক্রম করার পর সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মনে হয় যেন শহরটা ক্রমেই গ্রামের পেটে ঢুকে পড়ছে। চারদিকে কেমন গ্রাম ও শহরের একটা মিশ্রিত মায়াবী রূপ চোখে পড়ে। মেট্রোহাউজিং এলাকায় শ্বাস ফেলতে না ফেলতেই প্রায় যানজটমুক্ত এই রাস্ড়া চলে আসে বুড়িগঙ্গা নদীর কাছে। এই জায়গাটার নাম বসিলা। বুড়িগঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রিজটার নাম, কাগজে-কলমে ভিন্ন হলেও, স্থানীয় মানুষ, বাস-হেলপার, সিএনজি ড্রাইভার ও রিকশাচালকদের কাছে তা বসিলা ব্রিজ নামেই পরিচিত। এই ব্রিজের মাথায় নেমে গাড়ি প্রধান সড়ক ধরে যে মুখে এগোচ্ছে ঠিক তার উলটো দিকে নদীর শরীর ঘেঁষে মাটির রাস্ড়া ধরে একটু এগোলেই ইরাদের বাড়ি। তাদের বাড়ির এই জায়গাটির নাম হচ্ছে ওয়াশপুর। শহরটা এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু এই জায়গাটি শহরের শ্বাসরুদ্ধকর বাতাস, বিষাক্ত কোলাহল, দালানকোঠার কৃত্রিম জড়াজড়ি থেকে অনেক দূরে। কংক্রিটের দৌরাত্ম্যমুক্ত, মাটির স্নেহ ও সান্নিধ্যে থাকা এখানকার মানুষ এখনো পুরোপুরি যন্ত্র হয়ে যায়নি। তারা একে অপরের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়, প্রতিবেশীদের বাড়িতে কয়জন সদস্য, তারা কী করে এবং তাদের নাম কী তাও তারা জানে।

ফারহানা রহমানও জায়গাটার সরল সৌন্দর্যে সন্তুষ্ট। কয়েক বছর ধরে ঘরে কিংবা ঘরের বাইরে— সর্বত্র তিনি বিক্রমপুরের আকাশ ও প্রকৃতি বঞ্চিত এক রূঢ় বান্ধবহীন পরিবেশকে মনোলোভা করে তোলার যে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ওয়াশপুরে স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ার পর প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে তার সেই মনোসংযোগহীনতা বহুলাংশে যেন প্রশমিত হয়েছে। মাটির শাস্ড় শীতলতা পা দিয়ে শুষে নেওয়ার জন্য ফারহানা রহমানের মন কত অজস্র প্রহর ছটফট করেছে। বসিলা ব্রিজ পার হয়ে ওয়াশপুরের মেঠো পথে নামতেই তার মনটা তাই অকৃত্রিম আনন্দে ভরে যায়। পুরো মেঠো পথটা তিনি, প্রথম এখানে আসার দিন যেমনটা করেছিলেন, এখনো ঠিক সেভাবেই স্যান্ডেল হাতে নিয়ে পায়ে ধুলোমাটি মাখতে মাখতে পরম আনন্দে বাড়ি পর্যন্ড় হেঁটে যান, তার স্যান্ডেলের সোল খুলে গেছে নাকি ফিতা ছিঁড়ে গেছে তা আবিষ্কারে লেগে থাকা অচেনা অনেক কৌতূহলী চোখকে উপেক্ষা করে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরপায়ে। আকাশ আবিরের লাল রঙে মাখা। ইরা ঝুলবারান্দাতেই গোলাপি চা শেষ করে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়িগঙ্গার তীরে ঘন হয়ে জমে থাকা মানুষের ঔৎসুক্যে, নিশ্চল নৌকার গলুইয়ে বসে থাকা অলস শৌখিন মাঝিতে, নীড়ে ফিরতে থাকা মুখরিত পাখিদের শরীরে, তার চোখ ঘুরছে নিরেট আনন্দ নিয়ে। কখনো তা চলে যাচ্ছে স্কুলের উন্মুক্ত মাঠে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দৌড়ঝাঁপে, যেখানে তার ছোটো ভাই খেলছে, যার নাম তারই নামের সাথে মিল রেখে রাখা হয়েছে ইরেশ। আসন্ন সন্ধ্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এই প্রথম, সত্যের মতো ইরার মনে হলো যে, টুকরো টুকরো এই মায়াজাগানিয়া দৃশ্যগুলো তার স্মৃতিতে একটু একটু করে জমে বিশাল একটা গ্যালারি তৈরি করছে। এই স্মৃতির গ্যালারি একদিন হয়তো তাকে কাতর করে তুলবে এবং একইসাথে ক্রমশ তিক্ত হয়ে আসা পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ জোগাবে।

প্রকৃতির সংজ্ঞাহীন সৌন্দর্যে ডুবে থাকা ইরা তখনো বুঝতে পারেনি তার মা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এতক্ষণ ডুবে ছিলেন

বইয়ের সৌন্দর্যে, যদিও বিকেলের পর তিনি বই থেকে দূরে থাকেন। নতুন শুরু করা ভার্জিনীয় উলফ রচিত মিসেস ডালওয়ে তাকে এতটাই ঘোরগ্রস্ড় করে ফেলেছিল যে তিনি সময়ের গতিশীলতা ভুলে গিয়েছিলেন। ইরা যে নীরবে তার পাশে গোলাপি চা রেখে গিয়েছিল, তাও তিনি খেয়াল করেননি। বইয়ের রহস্যময় জগতের নানা বৈচিত্র্যময় পথে চলতে চলতে হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন হাতের কাছে স্বচ্ছ কাপে প্রায় উষ্ণতা হারিয়ে ফেলা গোলাপি তরল। এই তরল সম্পর্কে তার পূর্বধারণা না থাকায়, আর তার বাহক সম্পর্কে বেখেয়াল থাকায়, কাপ ও কাপে রাখা তরল পদার্থটিকে তার জাদুমন্ত্রজাত মনে হয়। আধো উষ্ণ আধো ঠান্ডা সে তরলে, আধো শঙ্কা আধো ঔৎসুক্য নিয়ে চুমুক দিতেই তার জিহ্বা অপরিচিত এক সুস্বাদের আমেজে নরম হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ পরম বিস্ময়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জাদুমন্ত্রজোরে এই গোলাপ-রঙা-জলের উদ্ভব হয়নি, আবছা আবছা একটা মূর্তি এটি রেখে গিয়েছিল। মূর্তিটি যে ইরার সে সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হলেন, কেননা বাসায় সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। আধিভৌতিক চায়ের কাপের কল্পনাটা তাকে যতটা রোমাঞ্চিত করে, ইরার অলস হাতে, দেখতে মনোরম, খেতে মজাদার, এমন চা তৈরির ব্যাপারটা তাকে তার চাইতেও বেশি হতবিহ্বল করে তুলে। ওই মুহূর্তে ইরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। একদিকে মিসেস ডালওয়ে, অন্যদিকে ইরা— দুজনেই দুদিকে তার মনটাকে টানতে থাকে যেন। শেষমেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার আগমনের চিহ্ন আঁচ করতে পেরে তিনি মিসেস ডালওয়ের দরজা বন্ধ করে শূন্য কাপ হাতে ঝুলবারান্দায় এসে উপস্থিত হলেন এবং উপস্থিত হতেই দোলচেয়ারে আরও একটি শূন্য কাপ দেখতে পেলেন। কয়েক সেকেন্ড ইরার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও সে যখন তার অস্তিত্বের ঘ্রাণ পেল না তখন তিনি গলা উঁচু করলেন। তার কথাগুলো ইরার কানে দূর থেকে ভেসে আসা প্রতিধ্বনির মতো শোনাল : এমন সুন্দর চা কেমন করে তৈরি করলি? আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল না খেয়ে ওটাকে সাজিয়ে রাখি।

ইরা চমকে ফিরে তাকাল। মায়ের মুখ থেকে প্রশংসা শুনে ঠোঁটে

ছড়িয়ে পড়ল হাসি। মাকে ওর আস্ড় একটা হাসনাহেনার গাছ মনে হলো, আর তার মুখ থেকে নির্গত কথার এক একটা শব্দকে মনে হলো এক একটা সুগন্ধা হাসনাহেনা ফুল। ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ও বলল, তো সাজিয়ে রাখতেই পারতে।

ফারহানা রহমান বললেন, চাখতে গিয়েই বিপত্তিটা বাধল। লোভটা জেঁকে বসল মনের ওপর। স্বাদটা তাই সৌন্দর্যকে হার মানাল।

কথাটা শেষ করেই ফারহানা রহমানের মনে পড়ল যে তিনি কোনো ঘরেরই জানালা বন্ধ করেননি। বুড়িগঙ্গার নোংরা জল থেকে মাংসাশী মশারা ছুটে আসছে দলে দলে। ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন মূলত তার ঘাড়ে একটা মধুর হুল বিঁধার কারণে। তিনি আর্তনাদের মতো 'জানালা বন্ধ করতে হবে' বলেই দৌড়ের গতিতে পা চালালেন। ইরা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, কাল সকালে আমি ছোটো খালার বাড়িতে যাচ্ছি।

ইরা মাধ্যমিক পরীক্ষাশেষেও ওর ছোটো খালার বাড়িতে গিয়েছিল। ওর মায়ের চাচাতো এই ছোটো বোন অনার্স প্রথম বর্ষেই বেকার জীবনের সর্বশেষ দশায় থাকা তার প্রেমিককে বিয়ে করেছিল গোপনে। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর যখন পরিবার থেকে তার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন প্রেমিক থেকে সদ্য স্বামী হওয়া বেকার ছেলেটিকে ফেলে প্রায় এক বছর সে ইরাদের বাড়িতেই ছিল। ইরারা তখন বাসাভাড়া নিয়ে থাকত তাজমহল রোডে। দুজনের বয়সের মাত্রাতিরিক্ত তারতম্য না থাকায়, দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে, ছোটো খালার সাথে ওর একটা সুন্দর সখীত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ছোটো খালার প্রেমিক-স্বামীটিও ওদের বাসায় দু-একবার এসেছিল। তবে তাকে সে প্রথম দেখে তারও আগে, ছোটো খালার সঙ্গে নিউমার্কেটে যাওয়ার পথে। ওইদিন মোহাম্মদপুর থেকে ঝিগাতলা হয়ে মতিঝিলগামী বাসে উঠে ওরা যখন সায়েন্সল্যাবে এসে নামে, ওখানে ওভারব্রিজের কাছাকাছি ফুটপাতে, না মোটা না চিকন, না লম্বা না বেঁটে, শ্যামবর্ণ, মাথার সামনের দিকে ঘনত্ব কমে যাওয়া চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হালকা নীল জিনস

প্যান্টের সাথে সামঞ্জস্যহীন টিশার্ট, মাথায় তপ্ত সূর্য ও চেহারায় নির"ত্তাপ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসে ধ্যানমগ্ন পায়ে, ঠোঁটে হাসির রেখা না টেনেই। ইরা ছেলেটিকে দেখেই অনুমান করতে পারে, যদিও ওর ছোটো খালা ওকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি যে তার নববরও ওদের সাথে যোগ দেবে পথিমধ্যে। প্রথম দর্শনে ইরার মনে হয় যে, তার ছোটো খালার চেয়ে প্রায় আট-নয় বছরের বড়ো, আর দশটা ছেলের মতোই চোখ ও চিত্তকে আকর্ষিত করার মতো বিশেষ বৈশিষ্ট্যহীন এই ছেলেটির ওপর পারতপক্ষে প্রেমে পড়া যায়, কিন্তু তাকে বিদ্রোহ করে, উচ্চতর শিক্ষাজীবনের শুর"তে, গোপনে গোপনে, এত তড়িঘড়ি বিয়ে করার কোনো মানে হয় না। ওর ছোটো খালা যে কীজন্য এমন অবিমৃশ্যের মতো কাজ করল ওই মুহূর্তে সেটি ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।